চিরায়ত

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

KOBI PROKASHANI

পুতুলনাচের ইতিকথা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

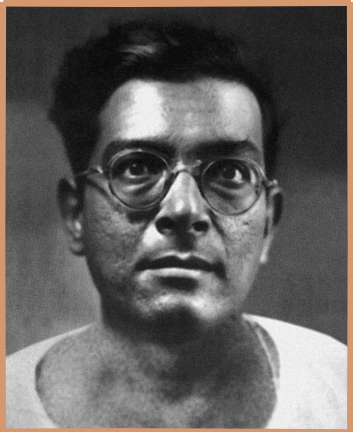
মূল্য ৪২০ টাকা

Putul Nacher Itikotha a novel by Manik Bandyopadhyay
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: October 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 420 RS 420 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96735-8-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

‘সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর,
চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু।
পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে
বসে খেলাচ্ছেন।’



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর রচনাবলি। ১৯০৮ সালের ১৯ মে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের দুমকায় তাঁর জন্ম, প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম ও ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে গভীরভাবে প্রভাবিত এই কথাসাহিত্যিক বাংলা ভাষায়, সাহিত্যে নিয়ে আসেন বৈপ্লবিক এক ঝড়। নির্মম, তীক্ষ্ণ আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করেছেন সমাজের, মানুষের মুখোশ। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মতো সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, অবচেতন মনের অন্ধকার, নিয়তিবাদ তীব্রভাবে উন্মোচিত। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার প্রকৃতি বোঝাতে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁর উত্তরপুরুষ লেখকদের মতো মানিককে স্থানে ও কালে দূরে সরে যেতে হয়নি।' ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর কালজয়ী এই স্রষ্টার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ঘটে।

পুতুলনাচের ইতিকথা

১

খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুংকার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।

বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজনের ঝাঁজালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম। এদিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারও বড় একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালোবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দিনের আলো বজায় থাকিতে থাকিতে বাজিতপুরের দু-একটি সাহসী পথিক মাঠ ভাঙিয়া আসিয়া ঘাসের নিচে অদৃশ্যপ্রায় পথ-রেখাটির সাহায্যে পথ সংক্ষেপ করে। বলিয়া-কহিয়া কারও নৌকায় খাল পার হইলেই গাওদিয়ার সড়ক। গ্রামে পৌঁছিতে আর আধ মাইলও হাঁটিতে হয় না। চণ্ডীর মা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এদিকে কাঠ কুড়াইতে আসে। যামিনী কবিরাজের চেলা সপ্তাহে একদিন গুল্মলতা কুড়াইয়া লাইয়া যায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ভিনগাঁয়ের সাপুড়ে কখনো সাপ ধরিতে আসে। আর কেহ ভুলিয়াও এদিকে পা দেয় না।

বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। আকাশের একপ্রান্তে ভীরু লজ্জার মতো একটু রঙের আভাস দেখা দিল। বটগাছের শাখায় পাখিরা উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং কিছু দূরে মাটির গায়ে গর্ত হইতে উইয়ের দলকে নবোদ্গাত পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবার সেই দিকে উড়িয়া গেল। হারুর স্থায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছের কাঠবিড়ালিটি এক সময় নিচে নামিয়া আসিল। ওদিকে বুঁদি-গাছের জালে একটা গিরগিটি কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলি পোকা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনে আসিয়া ছপ-ছপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বারবার মুখ ফিরিয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!

শশী বলিল, নৌকা ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যা গোবর্ধন। ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে। এখান দিয়ে নামানো যাবে না।

বটগাছটার সামনাসামনি খালের পাড় অত্যন্ত ঢালু। বৃষ্টিতে পিছলও হইয়া আছে। গোবর্ধন লগি ঠেলিয়া নৌকা পাশের দিকে সরাইয়া লইয়া গেল।

সাত মাইল তফাতে নদীর জল চব্বিশ ঘণ্টায় তিন হাত বাড়িয়াছে। খালে স্রোতও বড় কম নয়। শ্যাওড়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল, 'আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।'

শশী বলিল, 'দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।'

গোবর্ধন বলিল, 'ছুঁলাম বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন?'

শশী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গে কাদামাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমন কী বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে—মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।

'আয় তবে, দুজনে ধরেই নামাই। গাছের সঙ্গে টেনে নৌকা বাঁধ, সরে গেলে মুশকিল হবে। আচ্ছা, আলোটা আগে জ্বেলে নে গোবর্ধন। অন্ধকার হয়ে এলো।'

আলো জ্বালিয়া শ্যাওড়া গাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া গোবর্ধন উপরে উঠিয়া গেল। দুজনে ধরাধরি করিয়া হারুকে তাহারা সাবধানে নৌকায় নামাইয়া আনিল। শশী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'দে, নৌকা খুলে দে গোবর্ধন। আর দ্যাখ, ওকে তুই আর ছুঁস নে।'

'আবার ছোঁবার দরকার!'

শশী শহর হইতে ফিরিতেছিল। নৌকায় বসিয়াই সে দেখিতে পায়, খালের মনুষ্যবর্জিত তীরে সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাছে ঠেস দিয়া ভূতের মতো একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। পাগল ছাড়া এ সময় সাপের রাজ্যে মানুষ ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। শশীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা ছিল না। হাঁক-ডাক দিয়া সাড়া না পাইয়া গোবর্ধনকে সে নৌকা ভিড়াইতে বলিয়াছিল। গোবর্ধন প্রথমটা রাজি হয় নাই। এখানে এমন সময় মানুষ আসিবে কোথা হইতে? শশীরও চোখের ভুল। সত্য সত্যই সে যদি কিছু দেখিয়াও থাকে, ওই কিছুটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়া আর কাজ নাই, মানে মানে এবার বাড়ি ফেরাই ভালো। কিন্তু শশী কলিকাতার কলেজে পাস করিয়া ডাক্তার হইয়াছে। গোবর্ধনের কোনো আপত্তিই সে কানে তোলে নাই। বলিয়াছিল, 'ভূত যদি হয় তো বেঁধে এনে পোষ মানাব গোবর্ধন, নৌকা ফেরা।'

তখনও আকাশে আলো ছিল। হারুর চারিপাশে কচুপাতায় আটকানো জলের রুপালি রূপ একেবারে নিভিয়া যায় নাই। কাছে গিয়া হারুকে দেখিবামাত্র শশী চিনিতে পারিয়াছিল।

'ওরে গোবর্ধন, এ যে আমাদের হারু! এখানে ও এলো কী করে?

গোবর্ধনের মুখে অনেকক্ষণ কথা সরে নাই। শেষে সভয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মরে গেছে নাকি ছোটবাবু?'

'মরে গেছে। বাজ পড়েছিল।'

'আহা চুলগুলো বেবাক জ্বলে গেছে গো!'

হারুর বদলে আর কেহ হইলে, যে মানুষটা মরিয়া গিয়াছে তাহার চুলের জন্য গোবর্ধনকে শোক করিতে শুনিয়া শশীর হয়তো হাসি আসিত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে হারুকে এ অবস্থায় আবিষ্কার করিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। হারুর ছেলেমেয়ে আছে, আত্মীয়-বন্ধু আছে, সকলের চোখের আড়ালে একটা গাছের নিচে ওর একা একা মরিয়া যাওয়া কী শোচনীয় দুর্ঘটনা! গোবর্ধনের কথায় তাহার মন আরও বিষণ্ন হইয়া গেল।

গোবর্ধনের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে ছোটবাবু? গাঁয়ে খবর দি গে চলো।'

এমনিভাবে ফেলে রেখে চলে যাব গোবর্ধন?

'তার আর করছ কী?'

'গাঁ থেকে লোকজন নিয়ে ফিরতে ফিরতে শেয়ালে যদি টানটানি আরম্ভ করে দেয়?'

গোবর্ধন শিহরিয়া বলিয়াছিল, 'তবে কী করবে ছোটবাবু?

'হাঁক তো, কেউ যদি আসে।'

কিন্তু এই বাদল-সন্ধ্যায় আশপাশে কে আছে যে হাঁকিলে ছুটিয়া আসিবে? নিজের হাঁক শুনিয়া গোবর্ধন নিজেই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। আর কোনো ফল হয় নাই। রসুলপুরের হাটের দিন খালে অনেক নৌকা চলাচল করে; আজ কতক্ষণে আর একটি নৌকার দেখা মিলিবে, একেবারে মিলিবে কি না, তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই।

হারুকে নৌকায় নামাইয়া লওয়ার কথাটা তখন শশীর মনে হয়।

নৌকা খুলিবামাত্র স্রোতের টানে গতিলাভ করিল। গলুইয়ের উপর

দাঁড়াইয়া লগিটা ঝপ করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া গোবর্ধন হঠাৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, 'একটা কথা কও ছোটবাবু! উহার মুক্তি নাই তো?'

শশী হাল ধরিয়া বসিয়া ছিল। হাই তুলিয়া বলিল, 'কী জানি গোবর্ধন, জানি না।' তাহার হাই তোলাকে বিরক্তির লক্ষণ মনে করিয়া গোবর্ধন আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

শশী বিরক্ত হয় নাই, অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। হারুর মরণের সংশ্রবে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া শশীর কম দুঃখ হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা। মৃত্যু এক-একজনকে এক-একভাবে বিচলিত করে। আত্মীয়-পরের মৃত্যুতে যাহারা মর-মানবের জন্য শোক করে, শশী তাহাদের মতো নয়। একজনকে মরিতে দেখিলে তাহার মনে পড়িয়া যায় না সকলেই একদিন মরিবে—চেনা-অচেনা আপন-পর যে যেখানে আছে প্রত্যেকে—এবং সে নিজেও। শ্মশানে শশীর শ্মশান-বৈরাগ্য আসে না। জীবনটা তাহার কাছে অতি কাম্য অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।

মৃত্যুর সান্নিধ্য এইভাবে এই দিক দিয়া শশীকে ব্যথিত করে।

কিছুদূর সোজা গিয়া গাওদিয়ার প্রান্তভাগ ছুঁইয়া খাল পুবে দিক পরিবর্তন করিয়াছে। বাঁকের মুখে গ্রামের ঘাট। গাওদিয়া ছোট গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বিশেষ ধারে না। ঘাটও আর কিছুই নয়, কোদাল দিয়া কয়েকটি ধাপ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র! ঘাটের উপরে একটা টিনের চালা আছে। পাটের সময় সেখানে পাট জমাইয়া বাজিতপুরে শশীর ভগ্নীপতি নন্দলালের গুদামে চালান দেওয়া হয়। তিন-চার ক্ষেপ চালান গেলেই গাওদিয়ার পাট চালানের পাঠ ওঠে। তারপর সারা বছর চালাটা পড়িয়া থাকে খালি। গরু, ছাগল, মানুষ—যাহার খুশি ব্যবহার করে, কেহ বারণ করিতে আসে না। চালার সামনেই চণ্ডীর মার ছেলে চণ্ডী সারাদিন একটা কাঠের বাক্সের উপর কয়েক প্যাকেট লাল-নীল কাগজ মোড়া বিড়ি ও রেকাবিতে ভিজা ন্যাকড়ায় ঢাকা কয়েক খিলি পান সাজাইয়া বসিয়া থাকে।

ঘাটে কয়েকটি ছোট-বড় নৌকা বাঁধা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিতেও এখন না আছে আলো, না আছে মানুষ।

গোবর্ধনের মনে ভয় ছিল, তাহাকে নৌকায় পাহারা রাখিয়া শশী হয়তো নিজেই গ্রামে যাইতে চাহিবে। ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াই সে তাই বলিল, 'আমি তাহলে গাঁয়ে খপর দিগে ছোটবাবু?'

শশী বলিল, 'যা। পা চালিয়ে যাস গোবর্ধন। আগে যাবি গোয়ালাপাড়ায়। নিতাই, সুদেব, বংশী, ওরা সবাই যেন ছুটে চলে আসে। বলিস, আমি অন্ধকারে মড়া আগলে বসে রইলাম। আলোটা তুই নিয়ে যা, যেতে যেতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হবে। পিছল রাস্তা।'

আলো লইয়া গোবর্ধন চলিয়া গেল। এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ খুঁজিলে হয়তো এখনও একটু ধূসর আভা চোখে পড়ে; কিন্তু অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হইয়া আসিতেছে। শশী ভাবিল, আর পনেরো-বিশ মিনিট দেরি করিয়া বটগাছটার কাছে পৌঁছিলে হারুকে সে ঠাহর করিতে পারিত না। খাল দিয়া যাতায়াত করিবার সময় ভূত ও সাপের রাজ্যটির দিকে সে বরাবর চোখ তুলিয়া তাকায়। আজও তাকাইত। কিন্তু হারুকে তাহার মনে হইত গাছের গুঁড়িরই একটা অংশ। হয়তো মানুষের আকৃতির সঙ্গে গাছের অংশটির সাদৃশ্য লক্ষ করিয়া আর হারুর পরনের কাপড়ের শ্বেতাভ রহস্যটুকুর মানে না বুঝিয়া তাহার একটু শিহরণ জাগিত মাত্র। হারু ওইখানেই পড়িয়া থাকিত। কতদিন পরে শিয়ালের দাঁত ও শকুনির চঞ্চুতে সাফ-করা তাহার হাড় কয়খানি মানুষ আবিষ্কার করিত কে জানে! পঞ্চুকে চণ্ডীর মা যেমন আবিষ্কার করিয়াছিল। সর্বাঙ্গে খাবলা পচা মাংস, কোথাও হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুই হাতের মুঠার মধ্যে প্রকাণ্ড খরিস সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দড়ি।

স্রোতের বেগে নৌকা মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। নৌকার গলুইয়ে সে দোলন একটা জীবন্ত প্রাণীর অস্থিরতার মতো পৌঁছিতেছে। নড়িয়াচড়িয়া শশী এক সময় সোজা হইয়া বসে। মনে একটা বিড়ি ধরাইবার ইচ্ছা জাগিতেছিল। কিন্তু সেটুকু উৎসাহও সে যেন পায় না। তাহার চোখের সামনে চারিদিক ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়। তীরের গাছগুলি জমাটবাঁধা অন্ধকারের রূপ নেয়, জলের উপর জনহীন নৌকা ক'খানা হালকা ছায়ার মতো আলগোছে ভাসিতে থাকে। মাথার উপর দিয়া অদৃশ্য প্রায় কতগুলি পাখি শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। চারিদিকে জোনাকি ঝিকমিক করিতে আরম্ভ করে।

এত কাছেও হারুর মুখ ঝাপসা হইয়া যায়। তাহার মুখখানা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সে যে মরিয়া গিয়াছে এই সত্যটা শশী যেন আবার নূতন করিয়া অনুভব করে। ভাবে, মরিবার সময় হারু কী ভাবিতেছিল কে জানে! কোন কল্পনা, কোন অনুভূতির মাঝখানে তাহার হঠাৎ ছেদ পড়িয়াছিল?

মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে হারু বাজিতপুরে গিয়াছিল এটা শশী জানিত। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য ওই বিপথে সে পাড়ি জমাইয়াছিল। পথ তাহার সংক্ষিপ্তই হইয়া গেল। পাড়িও জমিল ভালোই।

ঘণ্টা দুই পরে গোটাতিনেক লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া হারুর সাত-আটজন স্বজাতি আসিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ ঘাটটি মুহূর্তে হইয়া উঠিল মুখরিত।

শশী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'নিতাই এসেছে, নিতাই?'

নিতাই সাড়া দিল, 'আজ্ঞে, এই যে আমি ছোটবাবু।'

নিতাইয়ের দায়িত্বজ্ঞান প্রসিদ্ধ। শশী অনেকটা ভরসা পাইল।

'হারুর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে নিতাই?'

'হয়েছে ছোটবাবু।'

আলো উঁচু করিয়া ধরিয়া সকলে তাহারা ভিড় করিয়া হারুকে দেখিতে লাগিল। গোবর্ধনের কাছে ব্যাপারটা তাহারা আগাগোড়া শুনিয়াছিল। শশীর কাছে আর একবার শুনিল।

তারপর ঘাটের খাঁজের উপর উবু হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল জটলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে শশীর মনে হইল, হারুর পরলোকগমন ওদের কথার মধ্যেই এতক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। বর্ষণক্ষান্ত বিষণ্ণ রাত্রে কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু রঙিন আলোয় হারুর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি যেন দৃশ্যমান ছায়াছবির রূপ গ্রহণ করিয়া চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। হারুর পরিবারের ক্ষতি ও বেদনার প্রকৃতি উপলব্ধি যেন এতক্ষণে শশী আয়ত্ত করিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল, সংসারে হারু যে কতখানি স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছে—এই অশিক্ষিত মানুষগুলির মনের মাপকাঠি দিয়াই তাহার পরিমাপ সম্ভব। এতক্ষণ হারুর অপমৃত্যুকে সে বুঝিতে পারে নাই। হারুকে সে আপনার জগতে তুলিয়া লইয়াছিল। সেখানে শূন্য করিয়া রাখিয়া যাওয়ার মতো স্থান হারু কোনোদিন অধিকার করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

নীরবে শশী অনেকক্ষণ তাহাদের আলোচনা কান পাতিয়া শুনিল। শেষে রাত বাড়িয়া যাইতেছে খেয়াল করিয়া বলিল, 'তোমরা তাহলে আর

বসে থেকো না নিতাই। রসিকবাবুর বাগান থেকে বাঁশ কেটে এনে একটা মাচা বেঁধে ফেল।'

নিতাই প্রশ্ন করিল, 'সোজা মশানবিলে নিয়ে যাবে কি ছোটবাবু?'

শশী বলিল, 'না। ওর বাড়িতে একবার নামাতে হবে।'

হারুকে সোজাসুজি শ্মশানে লইয়া গেলে অনেক হাঙ্গামা কমিত। কিন্তু হারুর মেয়ে মতির জ্বর। সকলে শ্মশানে আসিলেও সে আসিতে পারিবে না। তাহাকে একবার না দেখাইয়া হারুকে পোড়াইয়া ফেলিবার কথাটা শশী ভাবিতেও পারিতেছিল না। মতির কাছে খবরটা এখন কয়েক দিনের জন্য চাপিয়া যাওয়ার বুদ্ধিও বাড়ির কাহারও হইবে কি না সন্দেহ। মতি জানিতে পারিবে তাহারই জন্য বর খুঁজিতে গিয়া ফিরিবার পথে হারু অপঘাতে প্রাণ দিয়াছে। জ্বর গায়ে এই বর্ষার রাত্রে হয়তো সে শ্মশানে ছুটিয়া আসিবে। জোর করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে সকলকেই হয়তো সে ক্ষমা করিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু শশীকে সে সহজে মার্জনা করিবে না।

বলিবে, 'আপনি থাকতে আমাকে একটিবার না দেখিয়ে বাবাকে ওরা পুড়িয়ে ফেলেছিল গো!'

রসিকবাবুর বাগান হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া মাচা বাঁধা হইল। তারপর হারুকে মাচায় শোয়াইয়া হরিবোল দিয়া মাচাটা তাহারা কাঁধে তুলিয়া লইল।

শশী কহিল, 'এখন তোমরা হরিবোল দিও না। হারু শ্মশানযাত্রা করে নি, বাড়ি যাচ্ছে।'

কথাটা এমন করিয়া শশী ইচ্ছা করিয়া বলে নাই। নিজের কথায় নিজেরই চোখ দুটি তাহার সজল হইয়া উঠিল।

রাস্তাটি চওড়া মন্দ নয়, কিন্তু কাঁচা। বর্ষাকালে কোথাও একহাঁটু কাদা হয়, কোথাও এঁটেল মাটিতে বিপজ্জনক রকমের পিছল হইয়া থাকে। গরুর গাড়ির চাকাতেই রাস্তাটির সর্বনাশ করে সবচেয়ে বেশি। বর্ষার পর কাদা শুকাইলে মনে হয় আগাগোড়া যেন লাঙল দিয়া চষিয়া ফেলা হইয়াছে। শীত পড়িতে পড়িতে পথটি আবার সমতল হইয়া যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষতের উঁচু সীমানাগুলি গুঁড়া হইয়া এত ধুলা হয় যে পায়ের পাতা ডুবিয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাতাসে ধুলা উড়িয়া দুপাশের গাছগুলিকে বিবর্ণ করিয়া দেয়।

গ্রামে ঢুকিবার আগে খালের সঙ্গে সংযুক্ত নালার উপর একটি পুল পড়ে। পুলের নিচে স্রোতের মুখে জাল পাতিয়া নবীন মাঝি সেই অপরাহ্ণ হইতে বুকজলে দাঁড়াইয়া আছে।

নিতাই ডাকিয়া বলে, 'কী মাছ পড়ল মাঝি?'

নবীন বলে, 'মাছ কোথা ঘোষমশাই? জল বড় বেশি গো!'

'মাগুর-টাগুর পেলি নবীন? পেলে আমাকে একটা দিস। ছেলেটা কাল পথ্যি করবে।'

নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। বলে, 'জলে দেঁড়িয়ে কি মিছে কথা কইছি! এত জলে মাছ পড়ে না। ইদিকে তিন হাত ফাঁক রইছে দেখছ নি?'

হারুর মরণের খবরটা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে।

বলে, 'লোক বড় ভালো ছিল গো। জগতে শত্তুর নেই।'

তারপর বলে, 'ই বছর, জানো ঘোষমশায়, অদেষ্ট সবার মন্দ। তিন বর্ষা নাবল না, এর মধ্যে জল কামড়াতে নেগেছে।'

দিন নাই রাত্রি নাই, জলে-স্থলে নবীনের কঠোর জীবন সংগ্রাম। দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে। হারুর অপমৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার সময় তাহার নাই।

অথচ এদিকে মমতাও জানে। দশ বছরের ছেলেটা বিকাল হইতে পুলের উপর ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। জলে নামিয়া বাপের মতো সেও মাছ ধরিতে চায়। কিন্তু নবীন কোনোমতে অনুমতি দিবে না।

'রেতে লয় বাপ, জ্বর হবে। কাল বিহানে আসিস।'

'বিহানে জল রইবে নি বাবা।'

'হুঁ, রইবে নি আবার। তোর ডুব-জল হবে জানিস।'

পুল পার হইয়া কিছুদূর অবধি রাস্তার দুপাশে শুধু চষা খেত। তারপর গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে বসতি কম। রাস্তার দক্ষিণে ঝোপঝাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে পৃথক কয়েকটা ভাঙাচোরা ঘর, বৃষ্টিতে ঘরে-বাইরে ভিজিয়াছে। ওখানে সাত ঘর বাগদি বাস করে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে ছোটলোক, সবচেয়ে চোর। দিনে ওরা যে গৃহস্থের চাল মেরামত করে, রাত্রে সুযোগ পাইলে তাহারই ভিটায় সিঁধ দেয়। কেহ না কেহ ওদের মধ্যে ছ'মাস এক বছর জেলেই পড়িয়া আছে।

ছাড়া পাইবার পর গ্রামে ফিরিয়া বলে, 'শ্বশুর-ঘর থে ফিরলুম দাদা। বেশ ছিলাম গো!'

এটুকু পার হইয়া গেলে বসতি ঘন হইয়া আসে। বাড়িঘরের উন্নত অবস্থা চোখে পড়ে। পথের দুইদিকেই দুটি-একটি শাখাপথ পাড়ার দিকে বাহির হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখা যায়। মাঝে মাঝে কলাবাগান, সুপারিবাগান ও ছোট ছোট বাঁশঝাড় ডাইনে বাঁয়ে আবির্ভূত হয়। আমবাগানকে অন্ধকারে মনে হয় অরণ্য। কোনো কোনো বাড়ির সামনে কামিনী, গন্ধরাজ ও জবাফুলের বাগান করিবার ক্ষীণ চেষ্টা চোখে পড়ে। ক্রমে দু-একটি পাকা দালানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাড়িগুলি আগাগোড়া দালান নয়, এক ভিটায় দুখানা ঘর হয়তো ইটের, বাকিগুলি শণে ছাওয়া চাঁচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।

নির্জন স্তব্ধ পথে শববাহী তাহারাই জীবনের সাড়া দিয়া চলিয়াছে। শশীর বিষণ্ণতা ঘুচিবার নয়। আলো হাতে সকলের আগে আগে সে যাইতেছিল। নিতাই, সুদেব ওরা কথা কহিতেছে সকলেই, কথা নাই কেবল শশীর মুখে। পথের ধারে কোনো বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে দেখিলে তাহার ইচ্ছা হয় হাঁক দিয়া বাড়ির লোকের সাড়া নেয়। এক মিনিট দাঁড়াইয়া অকারণে বাড়ির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে। তাহার সাড়া পাইয়া কান্নার রোল তুলিবে না এমন একটি পরিবারের খবর না লইয়া হারুর বাড়ির দিকে চলতে সে যেন জোর পাইতেছিল না।

খানিক আগাইয়া বাজার।

এখানে গ্রাম জমাট বাঁধিয়াছে। দোকানপাটের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বাদলের রাত্রি গভীর হওয়ার আগে সবগুলি দোকানই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি টিনের চালা। একদিন অন্তর ওখানে বাজার বসে।

কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া একটা চালার নিচে আশ্রয় লইয়াছে। সম্মুখে তাহার ধুনির আগুন। আগুনে সন্ন্যাসী মোটা মোটা রুটি সেঁকিতেছিল। ওদিকের চালাটায় লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুরটা থাবায় মুখ রাখিয়া তাহাই দেখিতেছে। শশী তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল। পা বারবার জলকাদা-ভরা গর্তে গিয়া পড়িতেছিল। মনের গতির আজ সে ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিল না।

শ্রীনাথ দাসের মুদিখানার পাশ দিয়া কায়েতপাড়ার পথটা বাহির হইয়া গিয়াছে। হারুর বাড়ি এই পথের শেষ সীমায়। তারপর আর বাড়িঘর নাই। ক্রোশব্যাপী মাঠ নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে।